



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 460 - 467

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

আফসার আমেদের উপন্যাসে আখ্যানের নতুন দিশা : কিস্সার পুনরুদ্ধার

শাহনাজ বেগম

গবেষক, সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া

Email ID: shahnajbegam510@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Break
tradition,
Narrative,
New direction,
Kissa, Folk,
Keccha,
Scandal,
Restore.

Abstract

Afsar Ahmed (1959–2018) stands as a distinctive figure in contemporary Bengali literature for his efforts to break traditional narrative molds and introduce a 'new direction' through the restoration of the Kissa. While modern novels often follow Western linear structures, Afsar Ahmed revitalized the folk-based 'Kissa' style to authentically represent the lives of marginalized rural Muslim communities. In Bengal, this form gained popularity after the 15th century, blending Perso-Arabic themes with local folklore. Notable medieval examples include Yusuf-Zulekha and Laili-Majnu. Over time, 'Kissa' became a household literary tradition among Bengali Muslims. However, due to social prejudices, the word 'Kiccha' (the Bengali pronunciation) was often distorted into 'Keccha', a derogatory term implying scandal or infamy. Afsar Ahmed sought to reclaim this term, restoring its dignity and using it as a serious literary tool to address social and humanistic questions.

Discussion

বাংলা কথাসাহিত্যে আফসার আমেদ (১৯৫৯খ্রি. - ২০১৮খ্রি.) এক অনন্য নাম। তাঁর লিখনশৈলী এবং বিষয়বস্তু সমকালীন বাংলা সাহিত্যের প্রথাগত ধারাকে ভেঙ্গে এক নতুন দিগন্ত বা নতুন দিশা উন্মোচন করেছে। বিশেষ করে তাঁর রচনায় 'কিস্সা' বা লোকজ আখ্যানরীতির যে পুনরুদ্ধার আমরা দেখি, তা তাঁকে সমকালীন লেখকদের থেকে পৃথক করেছে। আফসার আমেদ সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্যে এমন একজন লেখক, যিনি গ্রামীণ মুসলিম জীবনের প্রান্তিক সমাজকে তুলে ধরতে গিয়ে চিরাচরিত 'কিস্সা' শৈলীকে আধুনিক উপন্যাসের আধারে নতুন রূপ দিয়েছেন।

'কিস্সা' শব্দটি আরবি 'কিস্বহ' থেকে এসেছে, যার অর্থ 'গল্প' বা 'কাহিনি'। এটি আরবি সংস্কৃতিতে মৌখিক গল্প বলার ঐতিহ্যের সাথে গভীরভাবে আবদ্ধ— প্রায়ই নৈতিক শিক্ষা, ঐতিহাসিক ঘটনা বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। উর্দুতে 'কিস্সা' রূপে উচ্চারিত হয়। শব্দটি বাংলা, হিন্দি এবং পাঞ্জাবি সহ বিভিন্ন ভাষা এবং সংস্কৃতিতে গৃহীত হয়েছে, যেখানে এটি একটি বর্ণনামূলক ফর্ম হিসাবে তার সারাংশ ধরে রেখেছে।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে, ‘কিসসা’ একটি ধারাকে বোঝায় কবিতা এবং গদ্য যা স্থানীয় বাংলা লোককাহিনিকে আরব এবং তুর্কী-পার্সিয়ান গল্প বলার ঐতিহ্যের প্রভাবের সাথে একত্রিত করে। এই আখ্যানগুলি প্রায়শই প্রেম, বীরত্ব, সম্মান এবং নৈতিক সততার থিমগুলির চারপাশে আবর্তিত হয়, যা ইসলামিক এবং প্রাক-ইসলামিক উভয় সাংস্কৃতিক উপাদানকে প্রতিফলিত করে।

‘কিসসা’ ঐতিহ্যটি পঞ্চদশ শতকের পর থেকে বাংলায় জনপ্রিয়তা লাভ করে, লেখকরা তাদের রচনায় পারস্য-আরব থিমগুলিকে মিশ্রিত করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে শাহ মুহম্মদ সগীরের ইউসুফ-জুলেখা, যাকে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সেরা কাজ বলে মনে করা হয় এবং বাহরাম খানের লাইলি-মজনু, যা বিখ্যাত ফার্সি গল্পের বাংলা রূপান্তর। এই গল্পগুলি প্রায়শই দোভাষী উপভাষায় লেখা হত, যা ফার্সি শব্দভান্ডারকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল এবং মুঘল যুগে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। এই আখ্যানগুলি বাংলা সাংস্কৃতিক উপাদানের সাথে ইসলামিক বিষয়বস্তুকে একত্রিত করেছে, সাহিত্যিক ল্যান্ডস্কেপকে সমৃদ্ধ করেছে। ঐতিহ্যটি লোক আখ্যান এবং রোমান্টিক কাহিনীতেও প্রসারিত হয়েছে, যেমন গুলে বাকাওয়ালি, যা ‘পরী’-এর মতো চমৎকার উপাদানগুলি বৈশিষ্ট্যযুক্ত। সময়ের সাথে সাথে, ‘কিসসা’ আরও ধর্মনিরপেক্ষ আকারে বিকশিত হয়, বিস্তৃত সাংস্কৃতিক প্রভাবকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং বাঙালি মুসলিম পরিবারগুলির মধ্যে একটি পারিবারিক সাহিত্য ঐতিহ্যে পরিণত হয়।

মুসলিম চিন্তাধারায়, ‘কিসসা’ শব্দটি প্রায়শই নৈতিক বা আধ্যাত্মিক পাঠসহ একটি গল্প বা আখ্যানকে বোঝায়। বিশেষ করে এটি ইসলামিক ঐতিহ্যের গভীরে প্রোথিত, যেখানে গল্পের মধ্য দিয়ে শিক্ষা, মূল্যবোধ এবং ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি বোঝানোর জন্য একটি শক্তিশালী মাধ্যম।

বাংলায় বিভিন্ন উপভাষায় ‘স’ ‘ছ’ রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন— ‘মুসলমান’ উচ্চারিত হয় ‘মুছলমান’ রূপে। তেমনই ‘কিসসা’ উচ্চারিত হয় ‘কিচ্ছা’ রূপে। এক্ষেত্রে অর্থ প্রয়োগ কিন্তু একই থাকে। হিন্দুদের মুসলিমদের প্রতি অবজ্ঞার ফলে এই ‘কিচ্ছা’ কাহিনি ‘কেচ্ছা’তে পরিণত হয়। আর অর্থ বিকৃতি ঘটে। কাহিনি থেকে হয়ে যায় কলঙ্ক কাহিনি। আফসার আমেদ সেই কিস্সাকে পুনরুদ্ধারের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের কিসসা সাহিত্য ধারার প্রতি আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছেন। এর সঙ্গে তিনি এও দেখিয়েছেন যদি উপন্যাস বিদেশি প্রভাব মুক্ত ভাবে লেখা হত, তবে তা হত কথকথার ঢঙ্গে। তিনি মোট ৬টি কিসসা লিখেছেন—

১. বিবির তালুক ও তালকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিসসা (১৯৯৫খ্রি.)
২. কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশ জন লোক (১৯৯৬খ্রি.)
৩. মেটিয়াবুরুজে কিসসা (১৯৯৮খ্রি.)
৪. এক আশ্চর্য বশীকরণ কিসসা (২০০৩খ্রি.)
৫. হিরে ও ভিখারিনি সুন্দরী রমণী কিসসা (২০০৭খ্রি.)
৬. এক ঘোড়সওয়ার কিসসা (২০১০খ্রি.)

আফসার আমেদ মনে করতেন, - প্রান্তিক মানুষের জীবনের গল্প কেবল পশ্চিমা রৈখিক বর্ণনাভঙ্গিতে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই তিনি পুঁথি পাঠের সুর, দাদি-নানীদের মুখে শোনা কিচ্ছা এবং লোককথার জাদুকারী উপাদানগুলোকে উপন্যাসের শরীরে বুনে দিয়েছেন। তাঁর আখ্যানে কথক এবং শ্রোতার এক নিবিড় সম্পর্ক থাকে, যা পুরনো কিস্সার মেজাজ মনে করিয়ে দেয়। প্রথাগত উপন্যাসে সময়ের গতি রৈখিক হয়, কিন্তু আফসার আমেদের আখ্যানে কিস্সার মতোই সময় কখনো বর্তমান, কখনো অতীত, আবার কখনো আদিমতায় ফিরে যায়।

মুসলিম সমাজ শরীর থেকেই আফসার আমেদ ‘কিসসা’ শব্দকে চয়ন করেছেন। আসলে নিন্দার্থক শব্দ হয়ে উঠেছিল তাই পুনরুদ্ধার দরকার ছিল। সেদিক থেকে আফসার আমেদের—

“আমার গল্পের ভরকেন্দ্রে যে গাভী, সমাজ-মানবিকতার প্রশ্ন ছুঁয়ে যায়, সেখানে কিসসা শব্দের পুনরুজ্জীবন ঘটে, সন্ত্রম শব্দ হিসেবে মান্যতা পায়।”

কিস্সায় আখ্যানের নতুন ধরণ খোঁজার চেষ্টা করেছেন তিনি। আবার মুসলিম সমাজ জীবন যেখানে উঠে এসেছে সেখানে ধর্মীয় পরিচয়ও বাদ যায়নি। নারীর অসহায়তার দিকগুলি বেশি এসেছে। আফসার আমেদ নিজেই বলেছেন –

“সমাজ ও সম্প্রদায়ের গণ্ডিগুলো কীভাবে প্রতিকূলতা তৈরি করে, তার একরকম পাল্টা হাওয়া বোধ হয় কিস্সার অন্তরমহলে খুঁজে দিয়েছি।”^২

কিস্সাতে উপন্যাসের প্লট, পটভূমি, সময়ের বিন্যাস সমস্ত কিছুকে অস্বীকার করে তিনি আখ্যানের একটি স্বাধীন রূপ খুঁজতে চেয়েছেন। আর সেই কিস্সাগুলির অভ্যন্তরে সমাজ ও সম্প্রদায়ের গণ্ডির বিরুদ্ধে একটি পাল্টা প্রতিক্রিয়া তিনি নির্মাণ করতে চেয়েছেন। তিনি নারীত্বের অভ্যন্তরীণ বিক্ষোভকেই কিস্সার অন্তরমহলে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন। চরম প্রতিবাদের সুরকে এখানে প্রতিবাদহীনতার ছলনার আশ্রয়ে প্রকাশ করেছেন। আফসার আমেদের দুটি কিস্সার মধ্য দিয়ে তাঁর আখ্যানের নতুন দিশা আলোচনা করেছি।

“বিবির মিথ্যা তালাকের... কাহিনি-সূত্র এসেছিল আমারই এক দূরের বন্ধুর কাছ থেকে। কথায় কথায় আমি খুঁজে পেয়ে গিয়েছিলাম। এক লাইনের মতো কাহিনি পেয়েছিলাম। এক যুবক তার স্ত্রীকে তালাক দেয়নি, অথচ রটে গেছে সে তালাক দিয়েছে। আর সেই যুবক পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে স্ত্রী-বিচ্ছেদে। সমাজের এই সত্য এক ঘটনা বন্ধুর সূত্রে পেয়ে ধীরে ধীরে আকার পেতে লাগল লেখা কাহিনিতে। অন্যরকম লেখার তাগিদ ভেতরে ছিল, সমাজসত্য তাকে লিখিয়ে নিল। কিস্সা সিরিজের উপন্যাসগুলির মধ্যে বাস্তব জীবনের সত্য অনেক কিছুতেই আছে, কিন্তু সত্যের আধার করেছি বেশি। যা প্রকাশ করেছি অতিকল্পনা, উদ্ভটত্ব, কৌতুক, শ্লেষ-তার ভেতর দিয়ে এক সাহিত্যিক সত্যে পৌঁছাতে চেয়েছি। সেই সত্য হয়তো বা প্রত্যক্ষ সত্যের চেয়ে আরও বেশি তীব্র, আরও বেশি মর্মভেদী-আমার স্বাধীন লীলা হয়ে উঠতে পেরেছিল কিস্সা সিরিজের উপন্যাসগুলি। এত স্বাধীন অন্য উপন্যাসের ভিতর হইনি। এই সিরিজের লেখাগুলির আনন্দময়তা, ফুর্তি, আমাকে অনুসন্ধিৎসু করেছে অন্য আত্মজিজ্ঞাসায়।”^৩

আফসার আমেদের ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত ‘বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিসসা’ উপন্যাসটি তাঁর ‘কিস্সা’ সিরিজের প্রথম এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ। এই উপন্যাসে তিনি সমকালীন সমাজ বাস্তবতাকে লৌকিক আখ্যান বা কিস্সার আদলে উপস্থাপনের এক নতুন পথ প্রদর্শন করেছেন।

এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র জাহান। মাত্র উনিশ বছর বয়সি এই তরুণী কীভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চাপানো ‘তালাক’ প্রথার শিকার হয়, লেখক তা কিস্সার চঙে বর্ণনা করেছেন। পুকুরে গোসল করতে গিয়ে শাড়ি হারিয়ে যাওয়ার মতো একটি তুচ্ছ ঘটনায় জাহানকে তার স্বামী নাসিম অপমান করে। যার ফলে অপমানিত জাহান বাপের বাড়ি চলে গেলে এই ঘটনা ‘মিথ্যা তালাক’-এর রূপ নেয়।

উপন্যাসটি মোট ২১টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। আফসার আমেদ প্রথাগত উপন্যাসের রৈখিক বর্ণনা বাদ দিয়ে কিস্সার মতো বৃত্তাকার বা শাখায়িত আখ্যান ব্যবহার করেছেন। এখানে বাস্তব ঘটনার সমান্তরালে স্বপ্ন, অবচেতন মনের কামনা এবং জনশ্রুতি (Rumor) মিশে একাকার হয়ে যায়।

জাহান বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার পর স্বামী নাসিম প্রতি রাতে স্বপ্নে তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার বাসনা দেখে। এই ‘স্বপ্নচারিতা’ কিস্সার এক চিরন্তন উপাদান, যাকে লেখক আধুনিক মনস্তত্ত্বের সাথে জুড়ে দিয়েছেন।

উপন্যাসটির শিরোনামে থাকা ‘হলুদ পাখি’ একটি শক্তিশালী রূপক বা মোটিফ। লোককথায় পাখি যেমন সংবাদবাহক বা ভাগ্যের প্রতীক হয়, এখানে হলুদ পাখি সম্ভবত নারীত্বের সেই স্বাধীনতার প্রতীক, যা সমাজ খাঁচাবন্দি করতে চায়। জাহানের জীবনের ট্রাজেডি আর হলুদ পাখির কিসসা যেন একই সুতোয় গাঁথা— যেখানে সুন্দর আর ধ্বংস পাশাপাশি অবস্থান করে।

আফসার আমেদ এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন কীভাবে একটি ‘মিথ্যা’ (তালাকের গুজব) সমাজের চোখে ‘সত্য’ হয়ে ওঠে। এই যে সত্য-মিথ্যার দোলাচল, এটিই কিস্সার প্রাণ। জাহানের জীবনে একে একে চারজন পুরুষের প্রবেশ এবং

তার শরীরের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা— এটি কোনো সাধারণ গল্প নয়, বরং এক বিভীষিকাময় রূপকথা যা হাজার বছর ধরে বাংলার নারীসমাজে চলে আসছে।

আফসার আমেদ তাঁর কিস্সাতে চরিত্রের নাম খুব অর্থপূর্ণ রেখেছেন (significant)। ‘বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি’ এবং ‘হলুদ পাখির কিস্সা’-তে নায়িকা জাহানের নামের মানে জগৎ। উপন্যাসেও আমরা দেখি জাহান বারবার তালাক প্রাপ্ত হয়ে একের পর এক পুরুষের কাছে পৌঁছে যায়। অর্থাৎ জগতের বিবিতে পরিণত হয়। নাসিম মানে মৃদু বাতাস অর্থাৎ নরম ব্যক্তিত্বের, যার তেজ নেয়, উপন্যাসেও দেখি প্রতিবাদহীন সত্তা। আজমত মৌলবির মানে সত্যতা, সম্মান বা গৌরব, যার কোনোটাই নেয় চরিত্রের অভ্যন্তরে। কিন্তু সকলে বিশেষ করে পুরুষেরা ভাবছে সৎ ব্যক্তি। তবে নারীদের কাছে আজমত মৌলবির পরিচয় গোপন নেই— বড়ভাবির বক্তব্যে মৌলবির পরিচয় উঠে এসেছে ‘গাড়োয়ানের ব্যাটা’ বলে। জাহান তালাকের পর একটায় দাবি রাখে – সে আজমত মৌলবির বিবি হতে চায় না। যা এক অর্থে ইসলামের ধ্বজাধারীর প্রতি প্রতিবাদ। আসলে প্রকৃত ইসলাম ও মুসলিম সমাজে প্রচলিত ইসলাম নিয়ে ধারণার মধ্যে ভ্রম রয়েছে— এই ভ্রম মৌলবিরাই তৈরি করেছে।

উপন্যাসে জাহান পুকুরে স্নান করার সময় শাড়ি হারিয়ে ফেলায় সায়া ব্লাউজে ঘাটে উঠে আসে। এই দোষের জন্য ধর্মপ্রাণ নাসিম তাকে থাপ্পড় মারে, ‘শুয়োরের বাচ্চি’ বলে। পরে রাতে নাসিম জাহানকে কাছে পেতে চাইলে জাহান অভিমান দেখালে, নাসিম জাহানকে লাথি মারে। ফলে জাহান ভোরের সময় কাওকে কিছু না বলে বাপের বাড়ি চকমধু চলে যায়। নাসিম অনুতাপ করলেও জাহানকে চকমধু থেকে আনতে যায় না, অপেক্ষা করে জাহানের নিজের থেকে ফিরে আসার। অন্যদিকে জাহানও অপেক্ষা করে নাসিম চকমধু থেকে তাকে নিয়ে যাবে কিন্তু আসে না। এই অপেক্ষার মাঝে অনেক দিন পেরিয়ে যায়। ফলে মিথ্যা রটনার উপযুক্ত সময় তৈরি হয়ে যায়। যার সুযোগ নেয় গাজি নামক একজন, যে নাসিমের ভাগ্যকে হিংসা করত। গাজি বাজারে কানা বেগুন ওয়ালার কাছে গুজব ছড়িয়ে দেয় নাসিম জাহানকে তালাক দিয়েছে, দুজন সাক্ষ্য রেখে এবং এই দুঃখের খবর পেয়ে জাহানের হলুদ পাখি প্রাণ ত্যাগ করেছে। সেখান থেকে চুড়িওয়ালার কানে যায় এই খবর তারপর গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে শেষপর্যন্ত জাহানের কানে আসে তারই তালাকের রটনা। প্রথমে সে বিশ্বাস না করলেও শেষে সেও ভাবে ছোট মিঞা তাকে সত্যি তালাক দিয়েছে তাই তাকে নিতে আসে নি। তবে আশ্চর্যের বিষয় নাসিম বা জাহানের বাড়ির লোক কেউই এই গুজবের সত্যতা যাচাই করে দেখছে না। মৃত হলুদ পাখি পেয়ে সকলের কাছে এই রটনা সত্য বলেই বিবেচিত হয়েছে। যে হলুদ পাখি গ্রাম বাংলার অতি সহজ লভ্য পাখি, যে পাখি ‘খোকা হক’ এরকম স্বরে ডাকে বলে গৃহস্থ ঘরে তাকে দুধ কলা খাওয়ানো হয়। সেরকম জাহানও খাওয়াতো। নাসিম বারবার তালাক দেয়নি বলা সত্ত্বেও সকলে তাকে মিথ্যুক বলে মনে করছে। ইমাম আজমত মৌলবি তাকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করছে তালাক দেওয়ার পর তা আত্মীকার করা বিধর্মীর আচরণ। সকলে ধীরে ধীরে তাকে পাগল মনে করছে। এই সুযোগে নাসিমের যুবতী দাদি হুসনা আরা নাসিমকে নানা ভাবে প্রলভিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই প্রলোভন এড়ানোর আশ্রয় চেষ্টা করে। অপরদিকে জাহানের প্রথমে মৃত হলুদ পাখির দাবিদার চুড়িওয়ালার সঙ্গে নিকা হয়, তারপর চুড়িওয়ালার ব্যবসার ক্ষতি হলে জাহানের পুনরায় তালাক হয়। এরপর মৃত হলুদ পাখি বেগুনওয়ালার হাতে এসে চটকে যায়, তাকেই নিজের ভাগ্য মনে করে জাহান তাকে নিকা করে আজমত মৌলবির নিকা পড়ানোর মধ্য দিয়ে। আর তারপরই কানা বেগুনওয়ালা জাহানকে বেগুন ক্ষেতেই ধর্ষণ করে। অর্থাৎ নিকার পর জাহানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কানা বেগুনওয়ালা যৌন সংসর্গে বাধ্য করে। জাহানের যুবতী শরীরকে ভোগ করতে সকল পুরুষই চাই এমনকি আজমত মৌলবিও। জাহান ও বিছানা নাসিমের কাছেও সমার্থক। জাহান কামার্ত পুরুষদের কাছে ‘ছিঁড়ে খাওয়ার’ পণ্য ছাড়া কিছু নয়। নানির কিস্সাতে ভবিষ্যৎ বার্তায় উঠে আসে কোনো এক অন্ধকার রাতে ঠিক মৌলবির হাতের নাগালে চলে আসবে জাহান—

“নানি জাহানের বুকে ও উরুতে নখের আঁচড় দেখাচ্ছে। বাতাসে হাত ঘুরিয়ে হাত ঘুরিয়ে সেই নখরাঘাতের মুদ্রা তৈরি করছে সে। কীভাবে যেন জাহানকে পেয়ে যায় ইমাম। কিছু জোনাকি ফরিং আর অন্ধকার রচনা করে নানি। যে অন্ধকারের ভেতর ভীত হয়ে উঠবে জাহান। যে অন্ধকারের ভেতর

জাহানকে বাগে পাবে ইমাম। যে বিবিকে ছোটমিঞা তালাক না দিলেও তালাক রটে যায়, সেই বিবিকে বাগে পেয়ে যাবে ইমাম।”^৪

কিস্সাতে যা তৈরি হবে সেটাই বাস্তবে ঘটবে এমন একটা ধারণা প্রচলিত আছে পাঞ্জাবের সূফীদের মধ্যে। বাংলার মুসলিম সমাজে সূফীদের প্রভাব ভালো ভাবেই পড়েছিল। “বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্সা”-তে নানি যা বলছে তাই জাহানের ভবিষ্যৎ হতে চলেছে এরকম ইঙ্গিত রয়েছে। অথচ প্রথমে জাহানের জীবনে যা ঘটছিল সেটুকুই নানি কিস্সাতে কাহিনি আর গানের মধ্য দিয়ে শোনাচ্ছিল। পরে যা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে সেরকম কিস্সা তৈরি করতে থাকেন। এই উপন্যাসে হলুদ পাখির কিস্সা জুড়ে দেওয়ায় কিস্সার গ্রহণযোগ্যতা জন-মানসে বেড়ে যায়। মিথ্যা তালাকের রটনাও হলুদ পাখির মৃত্যুর ঘটনার মধ্য দিয়ে সত্য রূপে প্রকাশিত হয়।

আফসার আমেদ এই উপন্যাসে মূলত প্রমাণ করেছেন যে, কিসসা কেবল বিনোদনের জন্য নয়, এটি শোষিত মানুষ বিশেষ করে নারীর জীবনভাষ্য তুলে ধরার একটি শক্তিশালী হাতিয়ারও বটে।

আফসার আমেদের ‘মেটিয়াবুরুজে কিসসা’ উপন্যাস পাঁচ পর্বে বিভক্ত— অশ্রু পর্ব, মিথ্যা পর্ব, কল্পনা পর্ব, প্রাক-বিবাহ পর্ব ও বিবাহ পর্ব। পর্ব ভাগ থেকেই অনুমিত হয় উপন্যাসে বিবাহ কাণ্ড প্রধান। যার বিবাহ নিয়ে এত কাণ্ড সে হল শফীউল্লাহ ওরফে শফী। এই শফী মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলের সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিমদের একজন। যার দাদা শওকতউল্লাহ সেখানকার অন্যতম বড় কাপড়ের ব্যবসায়ী। তার উপর শফী নিজে উচ্চশিক্ষিত, জ্ঞানী ও ধর্ম-শাস্ত্রও জানে। সে শুধু জানেই না মৌলবি মোল্লাদের ভুল ধরিয়ে দেয়, তর্ক করে—

“অনেক আলেম মৌলবিও তার সঙ্গে বিতর্কে এঁটে উঠতে পারে না। কে কোথায় ভুল ধর্ম আচরণ করছে, কোথায় কে ভুল ফতোয়া দিচ্ছে, সেসব প্রতিবাদ করার একমাত্র স্পষ্টবাদী লোক এই শফীউল্লাহ।”^৫

জ্ঞান ও সামাজিক প্রতিপত্তি থাকলেই এরকম করা সম্ভব। মধ্য চম্বিশের শফী অকৃতবিবাহ। তার ইচ্ছা যদি বিবাহ করতেই হয় তবে কোনো বিধবা মহিলাকে করবে। এরকম মানুষ শফী গোরস্থানে কান্নারত এক বিধবা রমণীর বাঁ পায়ের একটু অংশ দেখে কামাতুর হয়ে পড়ে। সে যেহেতু বিবেকবান ধর্ম শাস্ত্রে জ্ঞানী তাই নারীটি তার স্ত্রী না হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয়বার তাকানো তার জন্য গোনাহ এটা সে ভালো মতো জানে। তাই সেই মহিলা অর্থাৎ শাহনাজকে পরদিনই নিকাহ করে গোরস্থানেই কাদের মৌলবি এই নিকাহ পড়ায় ইসলামিক নিয়মে সাক্ষীর উপস্থিতিতে।

শফীউল্লাহর কামনার শুরু হয় গোরস্থানে এক বিধবা রমণীকে (শাহনাজ) দেখার মাধ্যমে। তার ধর্মীয় জ্ঞান তাকে সতর্ক করে যে, স্ত্রী না হওয়া পর্যন্ত কোনো নারীর দিকে দ্বিতীয়বার তাকানো ‘গোনাহ’ বা পাপ। এই পাপ থেকে বাঁচতে সে দ্রুত বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়, যা আদতে তার তীব্র শারীরিক আসক্তি বা মোহগ্রস্ত অবস্থারই বহিঃপ্রকাশ। শফী শিক্ষিত এবং ধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিত হওয়ার কারণে নিজের প্রতিটি অনৈতিক কাজকে ধর্মের মোড়কে জায়েজ করার চেষ্টা করে। সে মনে করে দ্রুত বিয়ে করাটা আল্লার কাছে জবাবদিহিতা থেকে তাকে বাঁচাবে, কিন্তু তার এই তাড়াহুড়ো ছিল মূলত শাহনাজকে পাওয়ার এক উদগ্র তৃষ্ণা।

শফীর মোহগ্রস্ততা চরম সীমায় পৌঁছায় যখন সে শাহনাজের কন্যা শাবানাকে দেখে। শাবানাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় সে এতটাই অন্ধ হয়ে যায় যে, বিয়ের রাতেই শাহনাজকে কোনো শারীরিক সম্পর্ক ছাড়াই তালাক দেয়। সে শরিয়তের মাসলা-মাসায়েল ঘেঁটে বের করে যে, মায়ের সঙ্গে মিলন না হলে কন্যার সঙ্গে বিবাহ ধর্মসম্মত।

উপন্যাসটি একটি পুরুষতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক সমাজের চিত্র তুলে ধরে। এখানে নারীরা অনেকটা ‘হাতের পুতুল’ এবং সম্পদের সামনে দরিদ্ররা অসহায়। শফী ও তার দাদা শওকতউল্লাহ তাদের ক্ষমতার দাপটে সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে।

যদিও শফীর পরিবারের মহিলারা অবদমিত, কিন্তু শাহনাজ তার মেয়ের জীবনের প্রশ্নে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। সে তার মেয়েকে নিয়ে বস্তিতে আত্মগোপন করে এবং বস্তিবাসী ও স্থানীয় মান্তান রুস্তম তাকে সহায়তা করে। এছাড়া শওকতের

পুত্রবধূ পারভিন, যে কি না উচ্চশিক্ষিত (বি.এ পাশ), একমাত্র নারী হিসেবে শফীর সোজাসুজি বিরোধিতা করার সাহস দেখায়। লেখক এর মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন যে শিক্ষাই হল নারী মুক্তির একমাত্র সোপান।

শেষপর্যন্ত শফী তার জ্ঞান ও সম্পদের অপব্যবহার করে আনু মান্তানের দল দিয়ে শাবানাকে অপহরণ করায়। ক্ষমতার কাছে শাহনাজের মানবিক প্রতিরোধ পরাজিত হয়।

আফসার আমেদের ‘মেটিয়াবুরুজে কিসসা’ উপন্যাসে শফীউল্লাহর কাহিনীটি কেবল কামনার কাহিনী নয়, বরং এটি তার জ্ঞান, ধর্মীয় ব্যাখ্যা এবং ব্যক্তিগত লালসার এক জটিল সংঘাত।

‘মেটিয়াবুরুজে কিসসা’ কেবল একটি ব্যক্তিগত লালসার গল্প নয়, বরং এটি পুঁজিবাদের সাথে শ্রমজীবীর দ্বন্দ্ব এবং পুরুষের কামনার বিপরীতে নারীবাদের সংগ্রামের এক অনন্য দলিল।

আফসার আমেদ উপন্যাসে দেখিয়েছেন শফী মাঝে মাঝেই বাস্তব জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পূর্ণিমার চাঁদ বা জ্যোৎস্নার প্রভাবে তার মধ্যে একধরনের ঘোরের সৃষ্টি হয়। তার ভাবনার জগৎ হয়ে ওঠে অতীন্দ্রিয়। কিসসা সাহিত্যে যেমন বাস্তব আর পরাবাস্তবের সীমানা মিশে যায়, শফীর এই চন্দ্রাহত দশা মেটিয়াবুরুজের ধুলোবালি মাখা জীবনকে এক মায়াবী রূপ দেয়।

শফী শুধু চন্দ্রাহত নয়, সে নবীদের কাহিনী বা ধর্মীয় কিসসাগুলোর মধ্যে নিজের অস্তিত্ব খুঁজে ফেরে। সে নিজেকে সেইসব পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কাহিনীর অংশ মনে করতে শুরু করে।

এই ‘নবী কাহিনী’ তার কাছে পালানোর পথ (Escapism) হিসেবে কাজ করে। বাস্তব জীবনের গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে সে কিসসার সেই পবিত্র ও রহস্যময় জগতে আশ্রয় নেয়।

শফীর এই ঘোরের পেছনে তার অবদমিত যৌন আকাঙ্ক্ষা এবং আধ্যাত্মিক অতৃপ্তি— উভয়ই কাজ করে। কিসসা ধারার উপন্যাসে দেহ আর মন আলাদা নয়। শফীর চন্দ্রাহত হওয়ার মুহূর্তগুলোতে তার কামজ ইচ্ছাগুলো নবীদের কাহিনীর পবিত্রতার সঙ্গে এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব লিপ্ত হয়। এটি তার চরিত্রের এক জটিল মানসিক স্তরকে উন্মোচিত করে।

আফসার আমেদ এখানে কিসসার আঙ্গিককে আধুনিক মনস্তত্ত্বের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। শফীর ‘চন্দ্রাহত’ হওয়াটা আসলে তার একাকীত্ব এবং প্রান্তিক জীবনের হাহাকার। এটিই তাকে এই কিসসার কেন্দ্রবিন্দু বা একধরনের ‘ট্রাজিক হিরো’ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

শফীউল্লাহ প্রচুর ধর্মীয় কেতাব, নবি-রসুলদের কাহিনী এবং প্রাচীন আখ্যান পড়েছে। তার মস্তিষ্কে সেই সব ‘কিসসা’ বা কাহিনী সবসময় ঘুরপাক খায়। সে কেবল এসব পড়ে না, বরং নিজের বর্তমান জীবনের সংকটের সঙ্গে এই নবী কাহিনীগুলোকে মিলিয়ে ফেলে। সাধারণ মানুষের চোখে সে হয়তো ‘অপ্রকৃতিস্থ’ বা পাগল, কিন্তু লেখকের দৃষ্টিতে শফীউল্লাহর এই হারিয়ে যাওয়াটাই তার নিজস্ব সত্য। সে বর্তমানের মেটিয়াবুরুজ থেকে অনায়াসে অতীতের কোনো অলৌকিক কাহিনীর জগতে প্রবেশ করে।

আফসার আমেদ এই উপন্যাসে প্রথাগত রৈখিক বর্ণনার বদলে ‘কিসসা’ বা কখন শৈলী ব্যবহার করেছেন। এখানে সাধারণ জীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনার পাশাপাশি হঠাৎ করেই শফীউল্লাহর পঠিত কেতাবের কাহিনীগুলো উপন্যাসের অংশ হয়ে ওঠে। লেখক পাঠকদের একটি ঘোরের মধ্যে নিয়ে যান, যেখানে মেটিয়াবুরুজের সাধারণ মানুষের জীবনের সাথে পৌরাণিক বা ধর্মীয় আখ্যানের সীমারেখা মুছে যায়।

‘মেটিয়াবুরুজে কিসসা’ কেবল একটি জনপদের গল্প নয়, বরং এটি মানুষের অবচেতন মনের এক ভ্রমণ। শফীউল্লাহর মাধ্যমে লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে, অতি-বাস্তবতার এই পৃথিবীতে কল্পনার জগত বা ‘কিসসা’ই মানুষের শেষ আশ্রয় হতে পারে।

আফসার আমেদ কিসসা পুনরুদ্ধারের জন্য লোকজ ঐতিহ্যের প্রধান উৎসকে ব্যবহার করেছেন— ‘কাসাসুল আশিয়া’ বা নবীদের কাহিনী শফীউল্লাহর মাধ্যমে উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে ওঠে। ইউসুফ-জুলেখা, সুলেমান নবী বা ইউনুস নবীর কাহিনীগুলোকে তিনি ধর্মীয় গণ্ডি থেকে বের করে মানবিক ও মনস্তাত্ত্বিক স্তরে নিয়ে এসেছেন।

পূর্বে কিস্সা সাধারণত সাধারণ মানুষের বিনোদনের মাধ্যম ছিল। প্রাচীনকালে ‘কিস্সা’ বা পুঁথি ছিল গ্রামীণ মানুষের বিনোদন ও নীতিশিক্ষার মাধ্যম। আফসার আমেদ এই ধারাটিকে শুধু নকল না করে একে আধুনিক উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিক স্তরে উন্নীত করেছেন। আফসার আমেদ এই মাধ্যমটিকে ব্যবহার করে মেটিয়াবুরুজের শোষিত, প্রান্তিক ও নিম্নবর্গীয় মুসলিম সমাজের জীবনের যন্ত্রণাকে এক মহাকাব্যিক রূপ দিয়েছেন। শফীউল্লাহর পাগলামি বা তার বিকৃত বাসনা আসলে এক বিচ্ছিন্ন মানুষের অবদমিত আকাঙ্ক্ষার ‘কিস্সা’। আফসার আমেদ ‘মেটিয়াবুরুজে কিস্সা’-র মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, আধুনিক জীবনের জটিলতা প্রকাশের জন্য কেবল বিদেশের টেকনিক নয়, বরং আমাদের নিজেদের মাটির প্রাচীন আখ্যানরীতি বা ‘কিস্সা’ অনেক বেশি কার্যকর। তাঁর এই পুনরুদ্ধার আমাদের হারানো কথকতাকে সাহিত্যের মূল স্রোতে নতুন জীবন দান করেছে।

যেখানে আধুনিক উপন্যাস যুক্তিনির্ভর, সেখানে আফসার আমেদ ‘অবিশ্বাস্য’ বা ‘অলৌকিক’ বিষয়কে কিস্সার আবরণে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। আফসার আমেদের কিস্সা কোনো অতীতবিলাস নয়, বরং এটি সমকালীন মানুষের মনস্তত্ত্ব বোঝার এক ধ্রুপদী চাবিকাঠি। আফসার আমেদের কিস্সা পুনরুদ্ধার কোনো ‘পিছনে ফেরা’ নয়। তিনি আধুনিক জীবনের জটিলতা, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রভাব এবং মানুষের কাম-ক্রোধ-লোভকে ব্যাখ্যা করার জন্য কিস্সাকে একটি নতুন ভাষা (Idiom) হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, একজন আধুনিক লেখক লোকজ ঐতিহ্যকে ধারণ করেও বিশ্বমানের কথাসাহিত্য তৈরি করতে পারেন। আফসার আমেদ কেন কিস্সার দিকে ফিরে গেলেন? এর উত্তর লুকিয়ে আছে আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ে। বিশ্বায়নের যুগে যখন আঞ্চলিক পরিচয় হারিয়ে যাচ্ছে, তখন কিস্সা পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে তিনি আমাদের লোকজ ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। কিস্সা কেবল গল্প নয়, এটি প্রান্তিক মানুষের টিকে থাকার লড়াইয়ের ভাষা। আফসার আমেদ এই ভাষাকেই তাঁর সাহিত্যের প্রধান অস্ত্র করেছেন। আফসার আমেদের আখ্যান কোনো ড্রয়িংরুমের শৌখিন আখ্যান নয়, তা কর্দমাক্ত মাটির গন্ধে ভরা এক জীবন্ত দস্তাবেজ। আফসার আমেদের এই ‘কিস্সা পুনরুদ্ধার’ কেবল সাহিত্যিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা নয়, এটি ছিল বিশ্বায়নের যুগে নিজের আত্মপরিচয় খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, আধুনিক নগরজীবনের বিচ্ছিন্নতা ও জটিলতা প্রকাশের জন্য আমাদের নিজস্ব লোকজ আখ্যানরীতি বা ‘কিস্সা’ অনেক বেশি শক্তিশালী মাধ্যম হতে পারে। তিনি আধুনিক উপন্যাসের কাঠামোর ভেতরে আমাদের লোকজ ঐতিহ্যের ‘কিস্সা’ রীতিকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। তাঁর আখ্যানের এই ‘নতুন দিশা’ মূলত শেকড়ে ফেরার এক শৈল্পিক সংগ্রাম।

Reference:

১. আমেদ, আফসার, মুসলমান সমাজ: নানাদিক, দে’জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৮৯
২. তদেব, পৃ. ৯০
৩. তদেব, পৃ. ৯০, ৯১
৪. আমেদ, আফসার, কিস্সা সমগ্র-১, বিবির মিথ্যা তালুক ও তালকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্সা, দে’জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ১১৮
৫. আমেদ, আফসার, কিস্সা সমগ্র-১, মেটিয়াবুরুজে কিস্সা, দে’জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ২০৫

Bibliography:

আকর গ্রন্থ -

- আফসার আমেদ, মুসলমান সমাজ: নানাদিক, দে’জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১
আফসার আমেদ, কিস্সা সমগ্র-১, দে’জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৬

সহায়ক গ্রন্থ -

- আফরোজা খাতুন, বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম অন্তপুর, দে’জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১

আফরোজা খাতুন, তালাক ও রাজনীতি, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২০
আমিনুল ইসলাম, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঔপন্যাসিক (১৮৬৯-২০১৩), পত্রলেখা, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা,
জানুয়ারী ২০১৫
আলমগীর সরকার, কিসসা সাহিত্য ও আফসার আমেদ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২১
কঙ্কর সিংহ, ইসলাম ও নারী, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৮
জাহিরুল হাসান, মুসলমানকোষ, পূর্বা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৩